কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে
“ইয়া আলী মাদাদ”

সৈয়দ নদীম আহমদ জাফরী

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে “ইয়া আলী মাদাদ”

লেখকঃ
সৈয়দ নদীম আহমদ জাফরী

সম্পাদকঃ
আসিফ আলী ইমামী

প্রকাশকঃ মাক্তাবে সাকালাইন

প্রকাশকালঃ ১৭ মে ২০২২ ইং

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

“ইয়া আলী মদদ”—এই বাক্যটি কারো কাছে ঈমান ও শক্তির প্রতীক, আবার কেউ কেউ এটিকে শিরক বলে মনে করে। কিন্তু যারা এমন মনে করে, তারা সুবিধামতো এই সত্যটি ভুলে যায় যে “আলী” আল্লাহর ৯৯টি গুণবাচক নামের (আসমাউল হুসনা) একটি। সুতরাং “ইয়া আলী মদদ” বলা কোনো অবস্থাতেই শিরক হতে পারে না।

তবুও কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারে যে, যখন আমরা “ইয়া আলী মদদ” বলি, তখন আসলে আমরা মাওলা আলী (আ.)-এর কাছেই সাহায্য চাই, আর তাই এটি শিরক। এই দুর্বল যুক্তির জবাব কুরআনের সূরা আরাফ-এর নিম্নোক্ত আয়াতের আলোকে দেওয়া যেতে পারে, যেখানে বলা হয়েছে—
“নিশ্চয়ই আমরা শয়তানদেরকে অবিশ্বাসীদের অভিভাবক বানিয়েছি।”
(সূরা আরাফ, ৭:২৭)

অবিশ্বাসীদের জন্য শয়তানরাই নিযুক্ত অভিভাবক ও সহায়ক। আর মাওলা আলী (আ.) হলেন ‘আমীরুল মুমিনীন’—মুমিনদের নেতা। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বহুবার ‘কুল্লে ঈমান’—সম্পূর্ণ ঈমানের প্রতীক—বলে সম্বোধন করেছেন।
উপরোক্ত আয়াত এবং নবী (সা.)-এর এই বক্তব্যের আলোকে আমরা আরও যুক্তি দিতে পারি যে, যদি অবিশ্বাসীদের জন্য শয়তানদের অভিভাবক ও সহায়ক নিযুক্ত করা যেতে পারে, তবে কেন মুমিনদের জন্য মাওলা আলী (আ.) অভিভাবক ও সহায়ক হতে পারবেন না?

অতএব, এই প্রবন্ধে আমরা কুরআন ও আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নাহর আলোকে যাচাই করার চেষ্টা করব—“ইয়া আলী মদদ” বলা আদৌ বৈধ আহ্বান কি না। আমরা শুরু করছি সূরা ইউনুস-এর নিম্নোক্ত আয়াত দিয়ে—
“আর আল্লাহ ছাড়া এমন কাউকে ডেকো না, যে তোমার কোনো উপকারও করতে পারে না, কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। যদি তুমি এমন কর, তবে অবশ্যই তখন তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”
(সূরা ইউনুস, আয়াত ১০৬)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ ছাড়া এমন কারো কাছে সাহায্য চাইতে নেই, যে আমাদের কোনো উপকার করতে পারে না এবং কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। সুতরাং সংকটময় মুহূর্তে আমাদের সবসময় আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। যেমনটি তিনি পরবর্তী আয়াতে বলেছেন—

“অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট, আর সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহই যথেষ্ট।”
(সূরা নিসা, আয়াত ৪৫)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) আমাদের জন্য অভিভাবক ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট। কিন্তু আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) অদৃশ্য—তাহলে প্রয়োজনের সময় আমরা কীভাবে তাঁর সাহায্য আহ্বান করব? এ বিষয়ে কুরআন বলছে—

“আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক (ওলি) নিযুক্ত করো এবং তোমার পক্ষ থেকেই আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করো।”
(সূরা নিসা, আয়াত ৭৫)

উপরের আয়াতটি মক্কার সেই মুসলমানদের একটি দলের দিকে ইঙ্গিত করে, যারা চরম সংকটের সময়ে এই বাক্য উচ্চারণ করে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। তাদের দোয়া ছিল—আল্লাহ যেন তাঁদের জন্য ঐশীভাবে নিযুক্ত একজন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাঠান, যিনি তাঁদেরকে নির্যাতন ও জুলুম থেকে রক্ষা করবেন। এই আয়াতের মাধ্যমে কুরআন নিশ্চিত করছে যে, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) একজন অভিভাবক ও একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করেন, এবং তাঁর মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর সাহায্য লাভ করি।

➤ অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে চূড়ান্ত যুক্তি হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, একজন প্রকৃত মুমিন সবসময় আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা)-এর কাছেই সাহায্য চাইবে, কারণ তিনিই অভিভাবক ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট। একজন মুমিনের উচিত এমন কারো কাছ থেকে সাহায্য না চাওয়া, যে তার কোনো উপকার করতে পারে না এবং কোনো ক্ষতিও করতে সক্ষম নয়। কেউ যদি এমন করে, তবে সে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) আমাদের দৃষ্টির আড়ালে, কিন্তু তিনি আমাদের রক্ষা করার জন্য একজন অভিভাবক ও একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করেন। সেই নিযুক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে যে সাহায্য আসে, সেটিই মূলত আল্লাহর সাহায্য। সুতরাং এই ঐশীভাবে নিযুক্ত অভিভাবকের কাছে সাহায্য চাওয়া কি আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা)-এর কাছেই সাহায্য চাওয়ার সমতুল্য নয়?

উপরোক্ত যুক্তিটি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগের দিকে ফিরে তাকাব। তবে তার আগে সূরা বনি ইসরাইল-এর নিম্নোক্ত আয়াতটি লক্ষ্য করি—

“বলো— হে আমার প্রতিপালক! আমাকে যেখানে প্রবেশ করাও, সেখানে সত্য ও সম্মানের সাথে প্রবেশ করাও; আর যেখান থেকে বের করো, সেখান থেকেও সত্য ও সম্মানের সাথে বের করো। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে এমন এক সাহায্যকারি দান করো, যার মাধ্যমে আমি সর্বপ্রকার সাহায্য লাভ করতে পারি।”
(সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৮০)

উপরের আয়াতটি আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা)-এর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য একটি স্পষ্ট নির্দেশ—যেন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, যাতে আল্লাহ তাঁকে ঐশীভাবে নিযুক্ত একটি সাহায্যকারি দান করেন, যা সর্বদা নবী (সা.)-এর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত মহাসাহায্যের উৎস হয়ে থাকে।

ইসলামের নবী (সা.) যখন উপরোক্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন, তখন আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) জিবরাইল (আ.)-কে ‘নাদে আলী’ সহ প্রেরণ করেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) তা পাঠ করেন এবং আল্লাহর সাহায্য আহ্বান করেন। ‘নাদে আলী’ ও উপরোক্ত আয়াতের এই সমাপতন (সময়ের ও অর্থের মিল) এই ঐশী দোয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে অনেক কিছুই বলে দেয়।

نَادِ عَلِيًّا مُظْهِرَ الْعَجَائِبِ، تَجِدْهُ عَوْناً لَكَ فِيْ النَّوَائِبِ، بِنُبُوَّتِكَ يَا مُحَمَّدُ، بِوَلاَيَتِكَ يَا عَلِيُّ

আলীকে ডাকো—যিনি বিস্ময়কর ঘটনাবলির প্রকাশক। অবশ্যই তাঁকে তোমরা সাহায্যকারী হিসেবে পাবে। তোমার মাধ্যমে, তোমার প্রদত্ত ক্ষমতা ও ওলির কর্তৃত্বের দ্বারা সব দুঃখ ও কষ্ট দূর হয়ে যাবে। হে আলী! হে আলী! হে আলী! সাহায্য করো

(সূত্র— আল-মাজলিসি, বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ২০, অধ্যায় ১২, পৃষ্ঠা ৭৩; মুহাদ্দিস আল-নূরী, মুস্তাদরাক আল-ওসায়েল, খণ্ড ১৫, অধ্যায় ৫১, পৃষ্ঠা ৪৮৩; আল-কাফ‘আমি, মিসবাহ, পৃষ্ঠা ১৮৩ ; মোল্লা আলী কারী, আল-আসরার, পৃ. ২৬৫-২৬৬; আজলূনী, কাশফুল খাফা ২/৪৮৯।)

খায়বারের দুর্গ যখন মুসলিম বাহিনী জয় করতে পারছিল না এবং যুদ্ধের মোড় তাদের বিপক্ষে যাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ‘নাদে আলী’ পাঠ করে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা)-এর নিকট দোয়ার মাধ্যমে মাওলা আলী (আ.)-এর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এরপর মাওলা আলী (আ.) সাহায্যে এগিয়ে আসেন, দুর্গটি জয় করেন এবং অলৌকিকভাবে তাঁর বাহুতে বিশাল দরজাটি তুলে ধরেন।
সহিহ মুসলিম-এ বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে —খায়বারের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
“নিশ্চয়ই আমি এই পতাকাটি এমন এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন। আর আল্লাহ তার হাত দিয়েই আমাদের বিজয় দান করবেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব বলেন:
“সেই দিন ছাড়া আমি কখনো নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা করিনি।”
তিনি আরও বলেন:
“আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং আশা করলাম যে এটি আমার প্রাপ্য হিসেবে আমি পেয়ে যাব।” কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) আলী ইবনে আবু তালিব (আ.)-কে ডাকলেন, তাঁর হাতে পতাকাটি তুলে দিলেন এবং বললেন:
“অগ্রসর হও, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাকে বিজয় দান করেন, ততক্ষণ ফিরে এসো না।”
ইমাম সুয়ূতি তাঁর তারিখুল খুলাইফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—
মাওলা আলী (আ.) এক হাতে দুর্গের দরজাটি ধরে রাখেন, তাঁর সাথীদের সেই সমতল দরজার ওপর দাঁড় করিয়ে, হাতের এক নড়াচড়ায় একে একে খন্দকের ওপর পার করিয়ে দেন। সুয়ূতি আরও যোগ করেন—
পরবর্তীতে আশিজন লোক একসঙ্গে চেষ্টা করেও সেই দরজাটি সরাতে পারেনি।

এটি প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য একজন নিযুক্ত সহকারী ও রক্ষক ছিলেন মাওলা আলী (আ.), যাকে এই দায়িত্বের জন্য ঐশী ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছিল। এই বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায় নিম্নোক্ত আয়াতের আলোকে —

“হে রাসূল (সা.)! তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাকে তাঁর বিশেষ সাহায্য এবং মুমিনদের মাধ্যমে শক্তিশালী করেছেন।”
(সূরা আঞ্চাল, আয়াত ৬২)

উপরোক্ত আয়াত নিশ্চিত করছে যে, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) নবী (সা.)-কে সাহায্য করার জন্য একজন মুমিনকে নিযুক্ত করেছিলেন। আবু হুরাইরার মাধ্যমে বর্ণিত এক হাদিস অনুযায়ী, যা ইবনু আসাকির উদ্ধৃত করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—**‘আরশ’-এ লেখা আছে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ঈশ্বর নেই, মুহাম্মদ (সা.) আমার বান্দা ও আমার নবী, এবং আমি তাঁকে আলীর মাধ্যমে সাহায্য করেছি।**
(সূত্র: দুররুল মানসুর, খণ্ড ৩, পৃ. ১৯৯; জালালুদ্দিন সুয়ূতি, তারিক ইবনু আসাকির, জাইনুল ফাল্লি)

সুতরাং, মাওলা আলী (আ.) হলেন ‘সুলতান-আন-নাসিরা’যেমনটি সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৮০-এ উল্লেখ আছে, যিনি নবী (সা.)-কে সাহায্য করার জন্য নিযুক্ত ছিলেন।

এবং নবী (সা.)-এর সহকারী ও রক্ষক হিসেবে তাঁর নিযুক্তির পর, তিনি উক্ত দায়িত্বের জন্য যথাযথভাবে সজ্জিত ছিলেন, যেমনটি নিম্নোক্ত আয়াত নিশ্চিত করছে:

“আর আমি লোহা অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে রয়েছে ভয়ংকর যুদ্ধশক্তি এবং মানবজাতির জন্য বহু উপকার; যাতে আল্লাহ পরীক্ষা করেন কে অদৃশ্য অবস্থায় তাঁকে ও তাঁর রাসূলদের সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিতে পরিপূর্ণ, মহাপরাক্রমশালী এবং নিজ ইচ্ছা কার্যকর করতে সক্ষম।

— সূরা আল-হাদীদ, আয়াত ২৫)”

এই আয়াতটি সেই ‘লোহা’-র প্রতি ইঙ্গিত করে, যা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা) তাঁর দ্বীন ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি)-এর সাহায্যের জন্য অবতীর্ণ করেছিলেন।

উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আকাশ থেকে তরবারি **‘যুলফিকার’** অবতীর্ণ করে তা মাওলা আলী (আলাইহিস সালাম)-এর হাতে তুলে দেন এবং বলেনঃ

“লা ফাতাহ ইল্লা আলী, লা সাইফ ইল্লা যুলফিকার।”
(আলী ছাড়া কোনো বীর নেই, আর যুলফিকার ছাড়া কোনো কার্যকর তরবারি নেই।)
(তথ্যসূত্র: 📚বিহারুল আনয়ার, খণ্ড ৪২, পৃষ্ঠা ৫৭. হাবিবুস সিয়ার; রওযাতুল আহবাব)

অতএব, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা) মাওলা আলী (আ.)-কে এক কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থানে নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে তাঁর নিজস্ব তরবারি যুলফিকার দ্বারা সজ্জিত করেন—যাতে তিনি পবিত্র যুদ্ধগুলোতে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে সাহায্য করেন।

➤ পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি)—যিনি সমস্ত জগতের জন্য রহমত, আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং মেরাজের রাতে সর্বোচ্চ স্তর “ক্বাবা কাওসাইন” অতিক্রমকারী একমাত্র নবী—এই সমস্ত মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও, এটা মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয় যে তিনি নিজে চাইলে খায়বারের দুর্গ জয় করতে পারতেন না।

তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়—যদি তিনি পারতেন, তবে কেন তিনি নিজে খায়বার জয় করলেন না এবং বরং মাওলা আলী (আ.)-এর জন্য অপেক্ষা করলেন দুর্গ জয় করার জন্য

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে চলুন আমরা কুরআন থেকেই পথনির্দেশ গ্রহণ করি।
সূরা আন-নামল থেকে নিম্নোক্ত আয়াতটি এ ক্ষেত্রে আমাদের সহায়তা করবে:

“সুলায়মান (আ.) তাঁর দরবারের লোকদের বললেন: ‘হে আমার দরবারের প্রধানগণ! তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যে রানী (বিলকিস)-এর সিংহাসন আমার কাছে এনে দেবে—এর আগেই যে তারা আমার সামনে অনুগত হয়ে উপস্থিত হবে?’
তখন জ্বিনদের মধ্য থেকে এক শক্তিশালী জ্বিন বলল: ‘আপনি আপনার আসন থেকে ওঠার আগেই আমি সেটি আপনার কাছে এনে দেব; নিশ্চয়ই আমি এ কাজে সক্ষম ও বিশ্বস্ত।’
সুলায়মান (আ.) কিছু বলার আগেই সেই ব্যক্তি, যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল (আসিফ ইবনে বারখিয়া), বলল: ‘আমি আপনার চোখের পলক ফেলার আগেই সেই সিংহাসন আপনার কাছে উপস্থিত করে দেব।’”
— সূরা আন-নামল, আয়াত ৩৮–৪০

উপরোক্ত আয়াতে দেখা যায়, সুলায়মান (আ.) রানী বিলকিস ও তার সম্প্রদায় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে আসার পূর্বেই তাঁর সিংহাসন আনার জন্য দরবারের লোকদের আহ্বান জানান। আসিফ ইবনে বারখিয়া, যাঁর কাছে আল্লাহর কিতাবের কিছু জ্ঞান ছিল, তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি চোখের পলকের আগেই সেই সিংহাসন এনে দেবেন—এবং তিনি তা করে দেখান।
এখানেও প্রশ্ন উঠতে পারে—যখন সুলায়মান (আ.) নিজেই একজন নবী ছিলেন, তখন তিনি কেন নিজে সেই সিংহাসন আনলেন না এবং কেন আসিফ ইবনে বারখিয়ার জন্য অপেক্ষা করলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আমাদের ইমাম আলী নাকি (আ.)।

ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম ইমাম আলী নাকি (আ.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন:
“সুলায়মান (আ.) কি নিজে সিংহাসন আনার জ্ঞান রাখতেন না?”
ইমাম আলী নাকি (আ.) উত্তর দেন:

“এ বিষয়টি আসিফ ইবনে বারখিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত।

এটা এমন নয় যে কেবল আসিফ ইবনে বারখিয়ার কাছেই ‘ইসমে আযম’-এর জ্ঞান ছিল আর হযরত সুলায়মান (আ.) সে বিষয়ে অবগত ছিলেন না। বরং সুলায়মান (আ.) নিজেও সেই একই জ্ঞান রাখতেন।
কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁর ‘উম্মত’—যার মধ্যে জ্বিন ও মানুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত—জেনে রাখুক যে তাঁর পরে আসিফ ইবনে বারখিয়াই আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত দলিল (হুজ্জত) হবেন। আর এই ‘ইসমে আযম’ আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী সুলায়মান (আ.) আসিফ ইবনে বারখিয়াকে প্রদান করেছিলেন।
এর ফলে মানুষ তাঁর নিয়োগ নিয়ে কোনো বিরোধিতা করতে পারবে না, এবং তাদের ওপর তিনি এক সুদৃঢ় প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন।”
(তথ্যসূত্র: মানাকিব, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪০৩–৪০৫; বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৯–১১, পৃষ্ঠা ১৭৫–১৮০)

এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় কেন নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি) মাওলা আলী (আ.)-এর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে খায়বারের দুর্গ জয় করেননি। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রিয় এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে নবী (সা.) তাঁর উম্মত-কে এই বার্তাই পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন—যাতে তারা মাওলা আলী (আ.)-এর নিয়োগ নিয়ে কোনো বিরোধিতা না করে; কারণ তিনি তাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত এক দৈব প্রমাণ (হুজ্জত) ছিলেন।

নবী পাক (সা.)-এর উত্তরসূরি হিসেবে মাওলা আলী (আ.)-এর এই নিয়োগ ছিল আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-এর প্রদত্ত দিব্য আদেশ অনুযায়ী।

উপরের এই সিদ্ধান্তকে আরও শক্তভাবে প্রমাণ করে পবিত্র নবী (সা.)-এর একটি প্রসিদ্ধ হাদিস, যেখানে তিনি বলেন:

"আলী তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক দিব্য প্রমাণ, আর আমি তার ওপর সাক্ষী।"

(তথ্যসূত্র: তারীখ ইবনে আসাকির, খণ্ড ৪৩, পৃষ্ঠা ২২০; ইয়ানাবি'উল মাওয়াদ্দাত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯৩—শব্দগত অর্থের নিকটবর্তী)

আমরা নবী পাক (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করার চেষ্টা করি, কারণ আমরা জানি—তিনি (সা.) যা কিছু করেছেন, সবই আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা)-এর দিব্য নির্দেশ অনুযায়ী। তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করলে আমরা সিরাতে মুস্তাকীম-এর ওপর অবিচল থাকতে পারি।

মাওলা আলী (আ.) হলেন সেই “সুলতানুন নাসীরা”, যার উল্লেখ কুরআনে এসেছে। তিনি ছিলেন সেই দিব্য সাহায্য, যা পবিত্র নবী (সা.) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, আর আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা) সেই সাহায্য নবী (সা.)-এর কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মাওলা আলী (আ.)-এর মাধ্যমে। সুতরাং আমরা যদি মাওলা আলী (আ.)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি—তবে কি তা পবিত্র নবী (সা.)-এর সুন্নাহরই অংশ নয়? এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে আমরা সূরা আন-নিসা, আয়াত ৭৫ নিয়ে আলোচনা করেছি, যেখানে মক্কার জনগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত একজন অভিভাবক ও সাহায্যকারী কামনা করেছিল। এরপরের অংশে আমরা দেখেছি যে মাওলা আলী (আ.) ছিলেন পবিত্র নবী (সা.)-এর জন্য নিযুক্ত সেই সাহায্যকারী।

অতএব, এটা বিশ্বাস করা যৌক্তিক যে—যখন আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা) মাওলা আলী (আ.)-কে পবিত্র নবী (সা.)-এর জন্য সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন, তখন আমাদের জন্য—অর্থাৎ নবী (সা.)-এর উম্মতের জন্যও—মাওলা আলী (আ.) হওয়া উচিত সেই নিযুক্ত রক্ষক ও উদ্ধারকারী।
চলুন, এই উপসংহার অংশে আমরা কুরআনের কয়েকটি আয়াতের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করার চেষ্টা করি।

“(হে মানুষ!) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে—তারই অনুসরণ করো, এবং তিনি ছাড়া অন্য কোনো (মিথ্যা/কল্পিত) অভিভাবক বা পৃষ্ঠপোষকের অনুসরণ কোরো না। কত অল্পই না তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো!”
— সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত ৩

“আর এ কথাও (বলে দাও) যে—তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, অতঃপর তাঁর দরবারে (গুনাহ থেকে ফিরে এসে) তওবা করো। তিনি তোমাদের নির্ধারিত এক সময় পর্যন্ত উত্তম ও কল্যাণকর জীবনোপভোগের সুযোগ দেবেন এবং প্রত্যেক মর্যাদাবান ব্যক্তিকে তাঁর অতিরিক্ত অনুগ্রহ (যুল-ফযল) দান করবেন। কিন্তু যদি তোমরা (তাঁর আদেশ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তোমাদের ব্যাপারে আমি এক মহাদিবসের ভয়ংকর শাস্তির আশঙ্কা করি।”
— সূরা হূদ, আয়াত ৩”

উপরোক্ত আয়াতটি তাদের সকলের জন্য এই প্রতিশ্রুতি বহন করে, যারা গুণ ও মর্যাদায় সমৃদ্ধ—যে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা) তাদের ওপর তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহ (ذِي الْفَضْل / যুল-ফযল) বর্ষণ করবেন।
ইবনে মারদুঈয়া তাঁর গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, এই আয়াতে উল্লিখিত “যুল-ফযল (ذِي الْفَضْل)” দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন মাওলা আলী (আলাইহিস সালাম)। ইসলামি পণ্ডিতদের বর্ণিত বহু হাদিস ইবনে মারদুঈয়ার এই বক্তব্যকে সমর্থন করে।

আর পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি)-এর একটি প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন:
“আলী (আ.)-কে ভালোবাসা ঈমানের নিদর্শন, আর তাঁকে ঘৃণা করা মুনাফিকির নিদর্শন।”
➤ এর অর্থ হলো—মাওলা আলী (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসাই আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা)-এর সেই অপরিসীম অনুগ্রহ (যুল-ফযল), যা তিনি মুমিনদের ওপর দান করেছেন। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা)—যিনি পরম দয়ালু ও পরম করুণাময়—সবসময়ই চান যে আমরা সিরাতে মুস্তাকীম-এর ওপর অটল থাকি। সেই কারণেই তিনি পরিস্কারভাবে কুরআনে আমাদের জন্য তাঁর নিযুক্ত অভিভাবকদের পরিচয় প্রকাশ করেছেন। তাদের আনুগত্য করলে আমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত থাকব।

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওলি (অভিভাবক ও নেতা) তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি) এবং সেই মুমিনগণ—যারা নামাজ কায়েম করে এবং রুকু অবস্থায় যাকাত প্রদান করে।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সেই ঈমানদারদেরকে নিজের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে—সে আল্লাহর দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আল্লাহর দলই বিজয়ী হয়।”
— সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ৫৫–৫৬

উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল সেই সময়, যখন মাওলা আলী (আলাইহিস সালাম) রুকু অবস্থায় থাকাকালে এক ভিক্ষুককে নিজের আংটি দান করেছিলেন। (তথ্যসূত্র: ইমাম নাসাঈ, সহীহে নাসাঈ; আল-জাম‘ বাইনুস সিহাহুস সিত্তাহ; সা‘লাবি)

অতএব, আমাদের ওলি ও অভিভাবক হলেন আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা), মাওলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি) এবং ইমাম আলী (আ.), আর তাঁর বংশধর আরও ১১ জন ইমাম। আমরা যদি তাঁদের ভালোবাসি, আনুগত্য করি এবং অনুসরণ করি, তবে আমরা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা)-এর বিজয়ী দলে অন্তর্ভুক্ত হব।

সবশেষে, ইমাম আলী (আ.)-এর সঙ্গে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা)-এর সম্পর্ক প্রসঙ্গে পবিত্র নবী (সা.) ও ইমাম মুহাম্মদ বাকির (আ.)-এর কয়েকটি হাদিস তুলে ধরা যাক:

• পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি) মাওলা আলী (আ.) সম্পর্কে বলেছেন:

“মানুষদের মধ্যে আলীই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি জানেন।”

(তথ্যসূত্র: কানযুল উম্মাল থেকে নির্বাচিত বর্ণনা, বাহামাশ আল-মুসনাদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩২)

• ইমাম মুহাম্মদ বাকির (আ.) বলেছেন:

“আল্লাহ তাআলা আলী (আ.)-কে নিজের এবং সৃষ্টিজগতের মধ্যবর্তী এক পতাকা (পরিচায়ক ও মানদণ্ড) হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। অতএব, যে তাঁকে চেনে—সে মুমিন; যে তাঁকে অস্বীকার করে—সে কাফির; যে তাঁকে চেনে না—সে পথভ্রষ্ট; যে তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে—সে মুশরিক; আর যে তাঁর উইলায়াত (দিব্য অভিভাবকত্ব)-এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে—সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

(তথ্যসূত্র: আল-কাফি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩৭; বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ৩২, পৃষ্ঠা ৩৬৪; আমালি আত-তূসী, পৃষ্ঠা ৪৮৭; হিলাতুল আবরার, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪২২; আল-হাদায়িক আন-নাদিরা, খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ১৪৮; কামালুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৪১২)

উপসংহার

অতএব, আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে মাওলা আলী (আ.)-ই সেই “সুলতানুন নাসীরা” (সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী), যিনি আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি)-কে তাঁর পুরো জীবনে সহায়তা করেছেন এবং ইসলামের উদ্দেশ্যের প্রতি সদা বিশ্বস্ত থেকেছেন।
মাওলা আলী (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসা ঈমানের নিদর্শন, আর তাঁর প্রতি বিদ্বেষ মুনাফিকির নিদর্শন। অতএব, তিনি হলেন সেই অপরিসীম অনুগ্রহ (ذِي الْفَضْل / যুল-ফযল), যা পবিত্র নবী (সা.)-এর উম্মতের মধ্য থেকে প্রকৃত মুমিনদের ওপর আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা) দান করেছেন।

➤ সুতরাং “ইয়া আলী মদদ” বলা কখনোই শিরক হতে পারে না; বরং এটি পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি)-এর সুন্নাহর অংশ এবং আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা)-এর এক দিব্য নির্দেশ।

মাওলা আলী (আলাইহিস সালাম)-কে আমাদের ওলি ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করাই হলো আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা)-এর বিজয়ী দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুমতি। অতএব, আসুন আমরা নাদে আলী পাঠ করি এবং আমাদের সবার জন্য দোয়া করি—যেন আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা) আমাদের সেবাসমূহ কবুল করেন, আমাদেরকে আমাদের ইমামদের ছায়াতলে রাখেন, আমাদের দুনিয়াবি বিষয়গুলো সহজ করে দেন এবং আখিরাতে আমাদের মুক্তি দান করেন।

আমাদের ফেসবুক পেজ লিংক

ক্লিক

আমাদের ইউটিউব চ্যানাল লিংক

ক্লিক

CONTACT US

01924892101